Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 306 – 311
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

তারাশঙ্করের 'কবি' : পুনর্বিবেচনা

ড. শিমুল চন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : sarkarshimul86@gmail.com

Keyword
নিতাই, কবিগান, প্রণয়, ঠাকুরঝি, বসন্ত, যৌনতা, ঝুমুরদল, আঞ্চলিকতা ও নিঃসঙ্গতা।

Abstract
প্রবাদ প্রতিম কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি 'কবি' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র নিতাই-এর সমাহত জীবন ও জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে উপন্যাসটির প্লট নির্মিত। উপন্যাসের কাহিনীকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে, নিতাই -এর বংশ পরিচয় ও ভবিষ্যৎ জীবনে কবিয়াল হওয়ার স্বপ্ন। দ্বিতীয় পর্বে, কবিয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ও নিতাই-ঠাকুরঝির প্রণয়। তৃতীয় পর্বে, নিতাইয়ের ঝুমুর দলে যোগদান এবং বসন্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা। চতুর্থ পর্বে, বসন্ত ও ঠাকুরঝির মৃত্যুতে নিতাইয়ের নিঃসঙ্গতা। পঞ্চম পর্বে, অস্থির চিত্তে তীর্থক্ষেত্রে গমন ও পরিশেষে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন। কবিত্বময়তা, নাটকীয়তা, বাস্তবতা, প্রণয়, নিঃসঙ্গতা ও জীবনদর্শন উপন্যাসটিকে এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। কবিয়াল নিতাই-এর সত্যাদর্শ ও জীবনাদর্শ উপন্যাসটিতে বড় হয়ে উঠেছে।

Discussion
পল্লীজীবনাশ্রয়ী আঞ্চলিক চেতনা পুষ্ট বাস্তব অথচ বিচিত্র স্বাদী এক রসসাহিত্য নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩শে জুলাই ১৮৯৮ – ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে আবির্ভূত হন। 'তিনি আমাদের অস্থির সংশয় বিক্ষুব্ধ অবিশ্বাসী যুগের প্রধান কথাশিল্পী।' কল্লোল- গোষ্ঠীর তরুন লেখকদের অবক্ষয় ধর্মী দ্বিধাগ্রস্থ জীবনচেতনার পটভূমিতে তারাশঙ্কর নিয়ে এলেন এক সুস্থ সবল ও ঋজু জীবনবোধ, জীবনের রস ও রহস্যের এক আদিম প্রাণবন্ত চেতনা।

"তারাশঙ্কর আধুনিক কালের জীবন শিল্পী, সমাজের ক্রনিক্লার, পরিচিত জীবনের রূপকার।"[১]

কবি উপন্যাসটি ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (মার্চ ১৯৪২) প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ 'সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু।' প্রকাশক কাত্যায়নী বুক স্টল, কোলকাতা। গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার পূর্বে 'কবি' পাটনা থেকে প্রকাশিত ও মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত 'প্রভাতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির বীজগল্প 'কবি'প্রবাসী মাসিক পত্রের ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের একটি সংখ্যায় প্রকাশ পায়। অভিন্ন নামে উপন্যাসটি ১৯৫৪ সনে হিন্দিতে এবং ১৯৭৩ সনে ওড়িয়াতে অনূদিত হয়। 'কবি' উপন্যাসের চলচ্চিত্রকার দেবকী বসু।

কবি উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের পূর্বে তারাশঙ্কর এর শিল্পিমানস ও জীবনবোধ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান এই মানুষটির বাল্য ও কৈশোর কেটেছে নগর জীবনের অনেক দূরে এই গ্রাম্য–পরিবেশে। তারাশঙ্করের জীবনবোধ সম্পর্কে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন–

> "এই 'জীবন' তার আলচ্য সাহিত্যে বহু বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত জীবনের করুণ অতীতচারণায়, কখনও বা লকজীবনের রোমান্টিক রূপচিত্রে সহজিয়া বৈষ্ণব, বেদে–সাপুড়ে, ডোম বাউড়ীর জীবনকথায়। আবার কখনও বা দারিদ্র্য পীড়িত কৃষকের করুণ জীবনচিত্রে অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে নিরুপায় কৃষক কতৃক শ্রমিক বৃত্তি গ্রহনের অসহায়তার বর্ণনায় কিংবা আদর্শ দীপ্ত অহিংস জাতীয়তাবাদে তাঁর ব্যাপক ও গভীর সুস্থ জীবনাগ্রহ মূর্ত হয়ে উঠেছে।"[২]

রাঢ় অঞ্চলের জলহাওয়া, সমাজ সংস্কৃতির অন্নে তার চেতনা পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করেছে। রাঢ় কেবল তন্ত্রসাধনার পীঠভূমি নয়, অনাথ লোকায়ত ব্রাত্যসংস্কৃতির বহু বিচিত্র শাখা বিস্তৃত যুগ থেকে এখানে অস্তিত্ব রক্ষা করা এসেছে। ডোম, বাউরি, বীরবংশী, সাওতাল, সাপুড়ে, বেদে ইত্যাদি অজস্র লোক সংস্কৃতির পঞ্চারন ক্ষেত্র এই রাঢ়ভূমি। এই দক্ষিনপূর্ব বীরভূমের সমাজ, সংস্কৃতি, এখানকার বিচিত্র নরনারী, এই অঞ্চলের বিচিত্র জনশ্রুতি, গাথাকাহিনী ও অন্ধ সংস্কার বহু বিচিত্র উপকরনের সমবায়ে এক রসোর্ত্তীর্ণ আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা তারাশঙ্কর। উত্তরকালে এই রাঢ় অঞ্চলের জীবনভাষ্য তিনি রচনা করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকৃত 'আঞ্চলিকতা'-র প্রবর্তক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর এই অর্থে শৈলজানন্দের উত্তরসূরী। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন–

> "তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের পন্থী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ 'কয়লাকুঠি'-র সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিন–পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন।"[৩]

আঞ্চলিক শিল্পী হয়ে ওঠার পেছনে ছিল তাঁর বহু বিচিত্র জীবনঅভিজ্ঞতা। এ প্রসঙ্গে অরুন কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন–

> "কংগ্রেস কর্মী রূপে দেশকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন, জমিদার বংশের জামাতা রূপে ধনতান্ত্রিক দাম্ভিকতার আঁচ পেয়েছেন, গ্রামের সন্তান রূপে মাটি ও মানুষকে ভালোবেসেছেন, শাক্ত–বৈষ্ণবদের ক্ষেত্র রুক্ষ উদাস লাল মাটির দেশকে জেনেছেন, চ্যাঙাড়ে – ডাকাত – বৈষ্ণব ও বৈরাগীদের চিনেছেন, বেদে – পটুয়া – মালাকার – লাটিয়াল – চৌকিদার – ডাকহরকরা–কবিয়াল–সাপুড়ে–দরবেশ কতো বিচিত্র মানুষকে জেনেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হল কারাজীবনের অভিজ্ঞতা।"[৪]

নিতাইচরণ নীচুজাতের ডোম বংশের ছেলে। শহর অঞ্চলে ডোম বলতে যাদের আমরা জানি নিতাইয়ের পূর্বপুরুষেরা ঠিক সে জাতের নয়। এরা লেঠেলের জাত। নবাবী আমলে পল্টনে থেকে এরা বীরত্বের খ্যাতি কুড়িয়েছিল। কম্পানি–আমলে নবাবের আশ্রয়চ্যুত হয়ে এরা যুদ্ধ-ব্যবসা ছেড়ে ডাকাতি করতে শুরু করে। তাই নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর, ঠাকুর্দা ছিল ঠ্যাঙাড়ে– নিজের জামাইকে হত্যা করেছিল, মামা ছিল ডাকাত, মা–র বাবাও ছিল খুনী। এহেন কীর্তিমান বংশের ছেলে নিতাই চেহারায় দীর্ঘ সবল কঠিনপেশি দেহ ও কালো হলেও দৃষ্টিতে ছিল সকরুণ বিনয়। কিন্তু পারিবারিক থেকে নিতাই যে কার উৎসাহে বা কোন্ প্রেরনায় কবিদলের আসরে বসে থাকত, দোয়ারদের দলে মিশে বসে পড়ত, কাঁসি বাজানো আর দোয়ারের কাজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে করত তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক দেননি।

নিতাই জীবনে কখনো চুরি করেনি। পূর্বপুরুষের নিশাচর বৃত্তি নিতাইয়ের স্বভাবে নেই। এজন্য সে পরিবারেও ঘৃণা কুড়িয়েছে। অবহেলা পেয়েছে। অবহেলিত হয়েই বোধহয়অন্য মানুষ হয়েছে। নৈশবিদ্যালয়ে জমিদার কাপড় দেবে এই লোভে অনেক বীরবংশী ডোমের ছলেদের সঙ্গে নিতাই ভরতি হয়েছিল। বছর তিনেক পাঠশালায় পড়েছিল। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কাপড় জামা গামছা পুরস্কারও পেয়েছে। পাঠশালায় পড়া রামায়ণ মহাভারতের গল্প, জন্তু – জানোয়ারের গল্প তার মুখস্থ ছিল। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে সব ছেলের তো পড়বার মন থাকে না, পারিবারিক অনুকূল পরিবেশও থাকে না।

একা নিতাইকে নিয়ে পাঠশালা চলে না। তাই পাঠশালা উঠে গেল। ইতিমধ্যে নিতাইয়ের মন গেছে কবিগানে। গ্রামাঞ্চলের কবিগানে অশ্লীলতা একটা বৈশিষ্ট। কিন্তু নিতাইয়ের মন আছে পুরাণ ও কবিতায়। পাঠশালার পাঠ চুকে গেলে নিতাইয়ের মামা বলেন তাকে ডাকাতের দলে ভিড়তে। নিতাই রাজি নয়। তার খাতা বই টান মেরে মামা ফেলে দিলে নিতাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এক গোঁসাইয়ের বাড়িতে মাহিন্দার চাকরি নিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝলে গোঁসাই পরের ধান চুরি করে নিজের গলা বোঝাই করে। তখন চাকরি ছেড়ে সে চলে এলো বন্ধু, স্টেশনের পয়েন্টম্যান – রাজা মুচির ঘরে। এই ঘরে রাজা ও তার ছেলের সঙ্গে যেদিন এসে সে ঢোকে সেদিনই রাজার শালী পনেরো ষোলো বছরেরকিশোরী মেয়েকে সে দেখেছে। পাশের গ্রামে তার শ্বশুর বাড়ি। এ গ্রামে সে ঘড়ির কাঁটার মতো সময় ধরে দুধ দিতে আসে।

ক্রমশ নিতাই পয়েন্টসম্যান রাজার ঘরের পাশেই থাকে। স্টেশনে মোট বয়। রাজার শালী ঠাকুরঝি তারও ঠাকুরঝি। তার কাছ থেকে সে দুধ নেয়। স্টেশনের স্টলের আড্ডায় ভেন্ডার 'বেনে মামা', বিপ্রপদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে হাসিঠাট্টার গানে নিতাইএর যে পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন তাতে মনে হয়, কবিগান – যাত্রাগান ও মেলায় মেতে ওঠা স্বপ্নময় কবিপ্রাণ একটি মানুষ হিসেবে সে সকলেরই স্নেহের পাত্র। সেই দিক থেকে তাঁর রুচিবোধে ও কবিদৃষ্টিতে ঠাকুরঝিকে দেখার বিস্ময় ও প্রতিক্রিয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ঔপন্যাসিক কাহিনীর বক্তা হলেও ঠাকুরঝিকে দেখার বর্ণনায় গ্রাম্য কবি নিতাইয়ের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি আনতে পেরেছেন : 'দীর্ঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মতো একটি অপরূপ শ্রী।' এই বিস্ময় নিতাইয়ের মনে যে শ্রদ্ধা জাগিয়েছে তাতে শালীর রূপ নিয়ে রাজার ঠাট্টার সহযোগী সে হতে পারে না : 'তাহলে সর্বাঙ্গে কচিপাতার মতো যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। এই শারীরিক ছন্দের অবলীলা নিতাই কোনদিনই ভোলেনি।

কবি গানের আসরে নিতাইয়ের হঠাৎ প্রতিষ্ঠার পর তাঁর চেনাশোনা লোকজনের মধ্যে তার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এমনকি নিতাই- এর বাড়ীর লোকজন তাকে বাড়িতেই থাকতে বলেছে। কিন্তু সে গেল না। তাতে তার সঙ্গী রাজা আরও খুশি। ভবিষ্যৎ কবিগায়ক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য সে পুরোনো পুঁথির পাতা ওল্টাতে শুরু করেছে, ছোটো কাজ ভেবে কুলিগিরি ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা ইয়ার্কিকে সে ক্ষমা করতে শুরু করেছে। জীবিকার সঙ্গে তাঁর প্রতিভা-সচেতন মনের লড়াই শুরু হয়েছে। কুলিগিরি ছেড়ে দোকান করার সংকল্প করেছে। কিন্তু বিয়ে করে সংসার করার ইচ্ছে তাঁর নেই। কারণ সে ভালোই জানে, ডোমের মেয়ের কবিয়ালের কদর বুঝবে না। তারপরই রাজার ঠাট্টায় আহত ঠাকুরঝির প্রতি নিতাইয়ের মনে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জগল। এবং সেই সহানুভূতির আবেগে নিতাইয়ের মুখে এল আশ্চর্য একটি গানের কলি 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।' নিজের গানের কলিতে নিজেই মুগ্ধ নিতাই একদিকে যেমন জীবিকা ও প্রতিভার দ্বন্দ্বে একটু ক্ষুন্ন, অন্যদিকে তেমনি ঠাকুরঝির সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ সমবেদনা প্রকাশে খুবই সহজ হয়ে পড়েছে। দুজনেই দুজনের অভিমান ভাঙিয়ে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ ঘোমটা–খসা ঠাকুরঝির কালো চুলে লাল জবা দেখে নিতাইয়ের কবিপ্রাণ জেগে উঠেছে। ঠিক এই মানসিক অবস্থায় আরেকটি নাটিকীয় মোড় এল। নিতাই কবির বায়না পেল। এবং সেই সুখবরটিও মুগ্ধ ঠাকুরঝির প্রায় সামনেই। পাঁচদিন বাদে যখন গায়ে চাদর দিয়ে পায়ে জুতো পরে সে গাঁয়ে এল তখন সে সকলেরই মুগ্ধ প্রশংসা কামনা করেছিল। কিন্তু তেমন কিছু নেই দেখে উদাস হয়ে যখন তার ঘরের কাছে তারই বাঁধা গানের কলি 'কালো যদি– শুনলো এবং চাদর-গায়ে জুতো-পায়ে কবিয়ালের প্রশংসা পেল ঠাকুরঝির কাছে তখন সে ঠাকুরঝিকে চোখ বুজতে বলে তার গলায় একটি কেমিকেলের সুতাহার পরিয়ে দিয়েছে। সে দৃশ্যের লজ্জা, সংকোচ, মুগ্ধতা ও ভাববিনিময়ের আঞ্চলিক ভাষারূপ এবং দুজনের দিক থেকেই রাজার সামনে এই ভাববিনিময় গোপন করার চেষ্টার দৃশ্যটি ভোলবার নয়।

মেলা-যাত্রা-পাগল এই মানুষটি যতই উন্মনা হোক, একটি খুঁটিতেই সে বাঁধা পড়েছে। সে খুঁটি-ঠাকুরঝি। জীবিকাহীন নিতাই যখন দারিদ্র্যে পড়ে দুধ নিতে চায়নি তখন ঠাকুরঝি এমনিই দুধ দিয়েছে, একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে, গল্প করে চলে গেছে। কবিয়ালের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা যেমন নিতাইকে দুধ নিতে বাধ্য করেছে, গরিব নিতাই তাকে ফুল দিয়ে তার আন্তরিক শ্রদ্ধাও জানিয়েছে। এই ভালবাসার রক্তিম আবাগের মুহূর্ত একটি অস্বস্তি নিতাইয়ের

মনে জেগেছে। ঠাকুরঝি পরস্ত্রী। যেন রাধাকৃষ্ণ প্রেমেরই রূপান্তরিত একটি ঘটনার পনরভিনয় হতে চলেছে। বদ্ধ ঘরে নিতাইয়ের মনে হয়েছে ঘরের সর্বত্র ঠাকুরঝির অশরীরী উপস্থিতি তার মনের খোঁজ খবর নিচ্ছে। ঘরের জানলা খুলতেই মনে হয়, ঠাকুরঝি যেন রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে দেখছে নিতাই তাকে ডাকে কিনা। এক গ্রাম্য কবির মনে অভিমানী কিশোরী প্রেমিকার আনাগোনার এই ছবি এঁকে তারাশঙ্কর যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী মনের বড়ো কাছাকাছি এসে গেছেন। ঔপন্যাসিক বসন্তের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে শাণিত-দীপ্তি ছুরির তুলনাটাই বেশি। অন্যদিকে ঠাকুরঝি সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে সতেজ পত্রপল্লবের ছবিই সর্বত্র। ঝুমুরের এই দলটি ভ্রাম্যমান। আসর পেতে গান করে, দলের মেয়েরা দেহের ব্যবসাও করে। বসন এ দলের বেপরোয়া নায়িকা। এই রসিক ও ধারালো মেয়েটিকে পেয়ে রসিক কবিয়াল নিতাই রসিকতার যোগ্য পাত্রীই পেয়েছে। তার মুখে গান আসে, বিদ্রুপ-ব্যঙ্গ ঠিকরে পড়ে, যোগ্য উত্তরও পায়। গাছতলায় বসা ঝুমুর দল নিঃসঙ্গ কিন্তু আগ্রহী নিতাইকে দলে যোগ দিতে বলে। রাজি হতে গিয়ে মনে বাধা আসে তার। বন্ধু রাজা আর রাজার শালী ঠাকুরঝি এই দুটি বাধা। যে বিদ্রুপের খোঁচায় ঠাকুরঝির চোখে হয়তো জল আসত, সেই বিদ্রুপ সমান দীপ্তিতে ফিরে আসে। আসর বসলে সকলের অনুরোধে নিতাই গান ধরে, তালে তালে নাচে। বসনের দিকে তাকিয়ে ছড়া কাটতেই বসন চলে যেতে চায়। গান থামিয়ে নিতাই তাকে আটকায়। তার পর তার গানের শেষে বসনের নাচ শুরু হয়। একবার নাচ সেরে মদ খেয়ে আবার নাচে। তারপর জ্বর গায়ে আসর থেকে বেরিয়ে নিতাইয়ের ঘরে ঢোকে। নিতাই খুঁজতে খুঁজতে ঘরে ঢোকে। অসুস্থ বসন তার মাথা টিপে দিতে বলে নিতাইকে। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে কে যেন সরে যায়। বসনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। সে নিতাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আলিপুরের মেলা থেকে নিতাইয়ের বায়না এল। নিতাই যেন মুক্তির পথ পেল। রাজা ঠাকুরঝিকে বিয়ে করার প্রস্তাব তিলে নিতাইকে। ঠাকুরঝির ঘর ভাঙতে চাইলে না নিতাই। যদিও সে স্বীকার করলে, ঠাকুরঝির প্রতি তার ভালোবাসার কথা। কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে নষ্ট করে নি। বোঝা যায়, নিজের পাপবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে রাস্তা খুঁজছিল। বসনের প্রতি আকর্ষণ এখন স্পষ্ট নয়, কিন্তু কবিখ্যাতির লোভ তার আছে। তাই গ্রাম ছেড়ে সে ঝুমুর দলে যোগ দিলে। ঝুমুর দলে ঢুকে দুটি পরস্পর বিরোধী মানসিকতার একত্র সহাবস্থান নিতাইকে বিস্মিত করেছে। মেলার পাশেই বৈষ্ণব মন্দিরে গিয়ে তার প্রাণ জুড়োয় আধ্যাত্মিক শান্তি মেলে। দলের মেয়েদের নাচ-গানের পারদর্শিতায় তাদের প্রতি নিতাইয়ের যেমন সম্ভ্রম ছিল তেমনি ঘৃণাও ছিল মনের গোপনে। মেলার বিচিত্র জনতা রাত্রিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়, দিনের বেলা স্নান সেরে নিকোনো- মাটিতে পুজো করে, উপবাস করে। এদিকে গানের পালা শুরু হলে নিতাইয়ের রুচি-মাফিক গান ও বসনের নাচ ঝিমিয়ে পড়ে। আসর থেকে রঙ চড়াবার দাবি আসে। বিপক্ষ দলের অশ্লীল গালিগালাজের দক্ষতায় নিতাইয়ের ঝুমুর দল পরাস্ত হয়। নিতাইয়ের এই রুচিরক্ষার পুরস্কার হিসেবে বসন্তের একটি চড় তার কপালে জোটে। অপমানের জ্বালায় নিতাই প্রথম মদ খেয়ে পরে আসরে বীরবংশী রক্তের উগ্রতার শিকার হয়। চরম অশ্লীলতায় আসর মাত করে বসন্তের ঘরে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। বসন্তের ঘরেই সে রাত কাটায়। এই নাটকীয় বর্বর জাগরণের পর থেকে নিতাই বসন ও দলের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে অনেক বেশি সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এই উন্মত্ততার জন্য নিজের ওপরেই ভেতরে ভেতরে ঘৃণা জন্মায়। দল ছাড়ার সংকল্প করলেও বসনের কাছে তার গোপন অভিপ্রায় ধরা পড়ে। বসনের তীব্র কঠিন বাঁধন সে বুঝতে পারে। বসনের ভেতরকার নারীত্বকে সে দেখতে পায়।

নিতাইয়ের মনে একদিকে বন্ধন আর এক দিকে অপ্রাপ্তি– দুয়ের টানাপোড়েন শুরু হয়। এই টানা পোড়েনের ছবিটি নিতাইয়ের আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক চমৎকার ভাবে ধরেছেন ।মনের গভীরে উদাসী হলেও নিতাই এখন অভ্যস্ত। দলের জীবনযাত্রায়, বসন্তের রোগশয্যায় সে অভ্যস্ত সঙ্গী। নিতাইকে এই জীবনে অভ্যস্ত করাবার জন্যেই ঝুমুর দলের জীবন-যাত্রার ছবিতে ঔপন্যাসিক ডিটেল এনেছেন। কিন্তু দুরারোগ্য ক্ষয় রোগে বসন্ত আবার অসুস্থ হল। এক গভীর রাত্রিতে ভগবানের বিরুদ্ধে অজস্র নালিশ করে নিতাইয়ের কোলে বসন ঢলে পড়ল।

তীর্থ থেকে বাংলাদেশে নিজের গ্রামে ফেরার শেষ পর্বে ঘরে ফেরার যে মাদকতা দেখা দিয়েছে নিতাইয়ের মনে, তার মধ্যে একটা অন্য মাত্রা আছে। সেটি হল অভ্যস্ত অনুষঙ্গে ফিরে যাবার গভীর টান। ঠাকুরঝি নিতাইয়ের স্বপ্ন, বসন্ত নিতাইয়ের অভ্যস্ত নেশা। নেশা হলেও স্বপ্ন যায়নি। বসন্ত এলেও ঠাকুরঝি মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। দুটিতে মিলে-মিশে নিতাইয়ের কবি জীবন।

> "প্রেরণা এবং কবিতা। কবির কাছে দুটিই সত্য। তাই মৃত্যুর পরেও ঠাকুরঝি আছে, বসন্তও আছে। কবির কাছে এই দুয়েরই মৃত্যু নেই। উপন্যাসটির মূল সৌন্দর্য এখানেই।"[৫]

কবি উপন্যাসের ভাষা নিয়ে যখন ভাবি তখন তাঁর একটি উক্তির কথা মনে পড়ে। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার (ভাষায়) কথা আমি বলতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বচার্যগণের মত নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারনেই করতে সক্ষম হইনি। সে শক্তি বোধ হয় আমার নেই এবং সে চর্চা করবার ঝোঁকও আমার জাগে নি।' কবি উপন্যাসে নিতাই, ঠাকুরঝি, বসন্ত, রাজন, বিপ্রপদ– সমস্ত মুখ্য ও গৌণ চরিত্র প্রত্যেকেই নিজের জবানিতে নিজের ভাষায় কথা বলেছেন। ঠাকুরঝিকে নিতাই বলেছে–

> "লোকে কি কথা বলবে জানিনা। আমি তোমাকে একটি কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছে।"[৬]

নিতাই–এর ভাষাতে 'নোকে' শব্দটিতে 'ল' এর পরিবর্তে 'ন' হয়েছে লোকে > নোকে এবং নেগে শব্দটি এসেছে লাগিয়া > লাইগ্যা (অপিনিহিতি) > লেগে (অভিশ্রুতি) > নেগে এই ভাবে। নিতাই আর ও বলেছে -

> "আর ভাই দুধের পেয়জোন আমার হবে না।"[৭]

এখানেও প্রয়োজন > পেয়েজন হয়েছে।

> "নিতাই এর মনগড়া এই উচ্চারণ ভঙ্গি ও ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।"[৮]

ঠাকুরঝির ভাষা ব্যবহারের আঞ্চলিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়–

> "ক্যানে? কি দোষ করলাম আমি?"/"লেবে না"[৯]

এখানে 'ক্যানে', 'লেবে' শব্দগুলি গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। কখনও বসন্ত নিতাইকে বলেছে –

> "এখন বাজারে যেতে হবেনা। একটুকুন ঘুমিয়ে লাও।"[১০]

একটু > একটুকুন, লাও এই শব্দগুলি আঞ্চলিক। রাজনের স্ত্রী ঠাকুরঝিকে বলেছে–

> "মরণ! কানছিস ক্যানে লো?"[১১]

এখানে 'ক্যানে', 'লো' শব্দগুলি আঞ্চলিক। আবার কখনও রাজার প্রত্যুত্তরে নিতাইয়ের হিন্দি বলবার প্রয়াস, তাও খানিকটা বাংলা মিশ্রিত –

> "ধন্য হোয়েগা ওস্তাদ, তুমারা মিত্র হোয়কে হাম ধন্য হোয়গা।"[১২]

কবি উপন্যাসের মধ্যে বহু প্রবাদ প্রবচন ছড়িয়ে আছে। যেমন–

ক. কিসে আর কিসে ধানে আর তুষে

খ. ভেক নাহলে ভিখ মিলে?

গ. যে বিয়ের যে মন্তর

তারাশঙ্করের ভাষা প্রসঙ্গে প্রদ্যুন্ন ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন–

> "'কবি' তে আমরা বহু স্বর শুনতে পাই; শুধুই লেখকের কণ্ঠস্বর নয়। আর এই যে লেখকের 'নিজস্ব – ভাষা' প্রায় কখনই নিজেকে জাহির করে না।"[১৩]

কবি উপন্যাসটি রাঢ় বাংলার প্রন্তকায়িত সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিতাই কবিয়ালের এক আশ্চর্য চাওয়া – পাওয়ার দোটানায় দোদুল্যমান ভাবলেশহীন ভবঘুরে জীবন কাহিনী। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দোলাচলে নিতাই ক্লান্ত। তাই শেষ জীবনে তার পুনরায় মাতৃভূমিতে ফিরে আসার আকূলতা লক্ষ্য করার মতো। নিতাই কবিয়ালের কবি জীবনে ঠাকুরঝি ও বসন্ত– এই দুই ভিন্নধর্মী নারী সত্তা। কবিত্বের প্রেরনা জুগিয়েছে। সে থেকে থাকেনি, অগ্রসর হয়েছে কবি সুলভ মনোভাব

নিয়ে। পাশাপাশি ঔপন্যাসিক রাঢ় বাংলার বিচিত্র জনজীবন ও সমাজকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাই ভীষ্মদেব চৌধুরী বলেছেন-

> "তাঁর উপন্যাসে উপজীব্য হল মানুষ ও সমাজ; সামাজিক সংঘাত ও দৈশিক রাজনীতি। বিশেষত, সমাজ ভিত্তির রূপ ও রূপান্তরের গতি ও চরিত্র স্বোপার্জিত জীবন বীক্ষায় বিধৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।"[১৪]

তাই রাঢ় বাংলার দরদী রূপকার তারাশঙ্করের হাতে 'কবি' এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে আধুনিক কথাসাহিত্যে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ২০০২, পৃ . ৩৭
২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৭১
৩. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৪২
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২৩
৫. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, তারাশঙ্কর অন্বেষা, সম্পা: সরোজবন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা, ২০০৭ পৃ. ৯৬
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৬
৭. তদেব, পৃ. ৪৬
৮. গাজী, আব্দুর রহিম, তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রকৃতি জগৎ ও লোকজীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৭০
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৬
১০. তদেব, পৃ. ৯৫
১১. তদেব, পৃ. ২৭
১২. তদেব, পৃ. ৩১
১৩. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন, তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ২০০১, পৃ. ২৬৬
১৪. চৌধুরী, ভীষ্মদেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৫

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আমার কালের কথা, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা, কার্ত্তিক ১৩৮৮
২. আমার সাহিত্য জীবন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স , কোলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬০
৩. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পা :), তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য, মডার্ন বুক এজেন্সী, কোলকাতা, চৈত্র ১৩৮৪
৪. নিতাই বসু, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, দে'জ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৮৮
৫. মুক্তি চৌধুরী, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ১৯৭৭
৬. সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক, তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য, প্রতিভাস, কোলকাতা, ১৯৮৯